একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Saikat Rakshiter Choto Golpo 'Ankshi' : Dalit Jiboner Bastobota o Jontrona

সৈকত রক্ষিতের ছোটগল্প 'আঁকশি': দলিত জীবনের বাস্তবতা ও যন্ত্রণা

Name of the Author: Dr. Monowar Ali

Affiliation: Assistant Teacher, Sarai Buniadpur Primary School, South Dinajpur, West Bengal, India

Abstract: Saikat Rakshit has written several short stories centered on the lives of Dalits, among which "Ankshi" is one of the notable ones. In this story, we can see a completely real picture of society in the Purulia district. By the people of the highest strata of society, individuals like Magaram represent the Dalit, oppressed, deprived, and proletariat classes who are constantly marginalized.

For mere subsistence, people like Magaram collect the cotton from the shimul tree using a hooked stick (ankshi)—a seemingly trivial activity in society—and sell it to somehow sustain their livelihood. Magaram has a family of five members. Running this family makes his life miserable.

Leelkamal and Nunu are his two children. To provide them with food, Magaram and his wife move from one place to another carrying the ankshi. Through the family of Magaram, the writer has depicted the condition of Dalit society in this story.

Keywords: Dalit life, Marginalized society, Oppression and deprivation, Rural Bengal, Shimul cotton collection, Struggle for livelihood,

সৈকত রক্ষিতের ছোটগল্প ‘আঁকশি’: দলিত জীবনের বাস্তবতা ও যন্ত্রণা

ড. মনোয়ার আলী

সমাজে দলিত মানুষের চিত্র আমরা চর্যাপদের মধ্যে যেমন পাই তেমনি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য এর নানা জায়গায় দলিতদের চিত্র পাই। আবার আধুনিক যুগের মধ্যে প্রবন্ধ থেকে শুরু করে উপন্যাস, ছোটগল্পের মধ্যেও আমরা এই অন্ত্যজ শ্রেণির চিত্র দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টির মধ্যে যেমন দলিত মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি রবীন্দ্র সমসাময়িক লেখকদের মধ্যেও আমরা কোথাও কোথাও এই দলিত মানুষের চিত্র পাই। তবে দলিত সমাজের মানুষদের নিয়ে যারা কাজ করেছেন, সারা জীবন লিখে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহাশ্বেতা দেবী, অনিল ঘড়াই থেকে শুরু করে আরো অনেকেই। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বেশিরভাগ রচনায় দলিতদের নিয়ে, তিনি আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের সঙ্গে বাস করেছেন। তাদের প্রাত্যহিক জীবন পর্যবেক্ষণ করেছেন। করেছেন অনুসন্ধান। কিন্তু বর্তমানকালে যারা দলিতদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন তাদের সম্পর্কে লেখালেখি করছেন তাঁদের মধ্যে হলেন নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, শুভঙ্কর গুহ প্রমুখ।

সৈকত রক্ষিতের একটি বিশিষ্ট ছোটগল্প ‘আঁকশি’। এই গল্পের প্রথমেই আমরা পাই জুয়ালকাঠি গ্রামের চিত্র। এ গ্রামে দূর দূরান্ত থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিচিত্র ধরনের গাছ। গল্পকারের মতে, ‘অদ্ভুত সব গাছ। বিচিত্র তাদের নাম।’ সেখানকার লোকেরা সেসব গাছকে ভালোভাবে চেনে না, জানেনা। তারা নিজের খেয়ালখুশিমত তাদের গ্রাম্য ভাষায় সে গাছ গুলোর নাম দিয়েছে— আগাই, কুড়োন, হটু ইত্যাদি। আর এই গ্রামের ভেতরে আছে গভীর জঙ্গল। সেখানে আছে নানা ধরনের বুনো গাছ গাছালি। গ্রীষ্মের সময় যখন মধ্যাহ্নের তীব্র তাপদাহে জঙ্গল যখন দাউদাউ করে পুড়তে থাকে সে সময় তার মধ্যে আবার প্রকৃতির একটা সৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। সেই সময় গলগল গাছে ফুল ফোটে। গাছে ভর্তি উলুরি ঝুলুরি ফুলে সারা জঙ্গল যেন মেতে ওঠে। আর এই জঙ্গলের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় সাঁওতালদের বাস। সেখানে মাঝে মাঝেই শোনা যায় আড়বাঁশির শব্দের সুর। সাঁওতালরা নাচে, গান করে, ধামসা আর নাকাড়া বাজিয়ে জঙ্গল একেবারে তোলপাড় করে তোলে। তবে জুয়ালকাঠির লোকদের সঙ্গে সাঁওতালদের খুব একটা গভীর সম্পর্ক নেই। এই গভীর জঙ্গলের বাইরে সাঁওতালদের তেমন দেখাও যায় না কিন্তু কখনো কখনো ঝুড়িভর্তি ক্যাঁন্দপাকা নিয়ে তারা গ্রামবাসীর কাছে বিক্রি করার জন্য আসে আর সাঁওতাল মেয়েরা শাল, দাঁতন, পাতা, রাইবাশের বোঝা মাথায় নিয়ে জুয়ালকাঠির পাশ দিয়ে সোজা চলে যায় বাজারের দিকে। তাদের বাজার বলতে আছে মানবাজার। এই জঙ্গলের আশেপাশে যত গ্রাম আছে তার একমাত্র সংযোগস্থল হল এই মানবাজার। এখানে ব্যবসা খুবই জমজমাট হয়।

গল্পের মধ্যে আমরা মাগারাম মুচির খোঁজ পাই। সে কখনো শহর দেখেনি তার কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই। তার শুধুমাত্র আছে বুড়ি মা, বউ, বেদনি আর দুটো ছেলে। ছোট ছেলেটি এখনো হাঁটতে শেখেনি। ফলে তার নামও রাখেনি তারা। তাকে তারা ডাকে নুনু বলে। আর বড় ছেলেটির বয়স আট বছরের কাছাকাছি।

মাগারাম এই ছেলেটির নাম দিয়েছে লীলকমল। এই পাঁচজন নিয়েই মাগারামের পরিবার। গল্পকার মাগারাম সম্পর্কে লিখেছেন— "জুয়ালকাটি গ্রাম জঙ্গলের প্রান্তে তার বসবাস অনেকটা গ্রাম্য ও আদিমতাপূর্ণ। মাটির যে ঘরটিতে, প্রকৃত অর্থে, মাথা গুঁজে সে থাকে, তার মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্র নেই। নেই কোনো কারিগরি স্পর্শ। সরল হাতে চৌকো করে তোলা মাটির পাতলা দেওয়াল। তার মাঝে খোঁটা পুঁতে ঢালু করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে চালার ঠাট। জঙ্গলের মূল গাছ কেটে বানানো এই চালা খড় দিয়ে ছাইতে পারেনি মাগারাম। ধান হয় তার সামান্য। খড়ের বদলে তাই সাউরি ঘাস কেটে, চালায় সে গুচ্ছগুচ্ছ ফেলে দিয়েছে। সেগুলো হিচড় লতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।"[১] মগারাম এর বাড়ির চিত্রের প্রতিটি পরতে পরতে দলিত শ্রেণির মানুষ তার পরিচয় আমরা পেয়ে যাই। নিজের ঘরের মধ্যে কপাট বসাবে তার সামর্থ্য নেই। সে মনে করে, তার তেমন সম্পত্তিও নেই। তাই ঘরের মধ্যে দরজা রাখারও তার কোনো তেমন প্রয়োজন নেই। দুর্দিনে তেমন কামাই নেই তার। চৈত্র মাসের দিনের সময় এমনও দিন আসে যে সে পানি জোগাড় করতে পারে না। তাই সে সময় ভুট্টা সেদ্ধ করে খেয়ে কয়দিন বাঁচে। কিন্তু এ শ্রেণির মানুষদের বাঁচা মরা নিয়ে উঁচু তোলার সমাজের মানুষের কোন কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও মাগারাম বাঁচতে চায়, জীবিত থাকতে চায়। সে মনে করে নিজেকে ভেঙেচুরে ক্ষতবিক্ষত করে বাঁচার মধ্যে আবার একটা নতুন স্বাদ আছে। আর এই স্বাদের জন্যই সে দিনমজুরের কাজ করে, শরীরের ঘাম ফেলে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে কায়িক শ্রম করে মাটি কাটে, পাথর ভাঙ্গে। কিন্তু তবুও তার মনে তেমন কোন প্রতিবাদ নেই। না ঈশ্বরের কাছে, না সমাজের কাছে। তাই প্রতিবাদ না করে লাঙ্গল ঠেলে ঠেলে অন্যের জমিতে সবুজ ফসল ফলায়।

সবুজ ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি মাঝেমাঝে দুটি অন্নের টান হলে খাবারের জোগাড়ের জন্য মাগারাম ঘুরে বেড়ায়। আবার কখনো নিতান্ত নিরুপায় হয়ে জীবিকার তাড়নায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পাহাড় থেকে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় পরিবারের সঙ্গে। তার বড় ছেলে লিল কমল বাবার সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সে জংলি হয়ে উঠেছে। অতি সহজেই সে শিমুল গাছ চিনতে পারে। আর শিমুল গাছ পেলেই তার পিতা খুশি হয়ে ওঠে। এই শিমুল গাছের ফল পাড়ার জন্য তারা আকসি ব্যবহার করে। লম্বা লাঠির আগায় একটি লোহার পেরেকে দিয়ে বাঁধা থাকে তাকেই সেখানকার স্থানীয় ভাষায় আক্সি বলা হয়। কিন্তু এই শিমুল গাছের আর দেখা পাওয়া যায় না জঙ্গলের কাঠ সাপাই হয়ে চলে যায় টাটা চান্ডিল পুরুলিয়াতে। শুধু মাগারাম নয় তার মত আরও অনেকেই জুয়াল কাঠির গ্রামের লোকেরা শিমুল গাছের সন্ধানে এক জায়গা থেকে আর অন্য অন্য এক জায়গায় ফেরে। শুধু মাগারাম নয় কালু আদম ভদ্রমহালি বৈদ্যনাথ রৈথামুচি আর তার সঙ্গে সঙ্গে কাহাল পাড়ার বাউরিরাও আছে। সঙ্গে আছে ঘাগড়া কাশিডি ভালোবাসা বামুনী পিয়ারসোল এইসব সর্বহারা অভাবী মানুষেরা। প্রায় প্রতিটি বছরে চৈত্র বৈশাখ মাসে নদীপুকুর খাল বিল এ দ্বারা সমস্ত শুকিয়ে যায়। এই অকাল সময়ে শিমুল গাছি তাদের পেটের যোগান দেয় তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। এই শিমুলের গাছের ফল থেকে তুলো বের করে এই শ্রেণির মানুষেরা

মানবাজারে আরোদ খানায় বিক্রি করে দুটো পয়সার আশায়। কিন্তু এদিকে প্রকৃতিও সংকুচিত হয়ে চৈত্র পেরিয়ে গেলেই শিমুলের ফল আর তেমন পাওয়া যায় না শুকিয়ে ফেটে পড়ে যায় বৈশাখের ঝরে। এই শ্রেণির মানুষদের শুধু উঁচু তলার মানুষরা নয় সমাজের সর্ব শ্রেণির মানুষরা তাদের সর্বহারা করে তুলেছে তার পাশাপাশি নিষ্ঠুর প্রকৃতির নিয়ম তাদের পেটের যোগান থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে।

তিন-চার জন মিলে একটি দল করে আঁকশি, ঝুড়ি বস্তা সঙ্গে নিয়ে তারা দূর-দূরান্তের গ্রামে চলে যায় শিমুল ফলের আশায়। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা নিজের ঘরে ফেরে। আবার পরদিন তারা বেরিয়ে পড়ে এক অজানা জায়গায়। আর এই তাগিদেই মাগারাম সকাল-সকাল ছটফট করে বেরিয়ে পড়ে। পরিবারের পাঁচজনের জন্য মাগারাম কোথা থেকে খাবার জোগাড় করবে তার চিন্তায় সর্বদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। তার ছোট ছেলে নুনু তুলতুলে ছাগল ছানা হাতের নাগালে পেলেই খুশিতে সে ভরে ওঠে। সংসারের সকালের কাজকর্ম করতে গিয়ে দেরি হয়ে যায় বেদেনি'র। আর এই কাজে একটু বেলা হয়ে গেলে বেদেনি বলে—"অমন বেলা করে ঘর থেকে বেরিয়ে ক্রোশ ক্রোশ হাঁটা তো সহজ না। রোদের তাতে পা পুড়ে যায়। মাথা ঝিমঝিম করে।"[২] তাই মাগারাম এ বিষয়ে বেদেনিকে সহযোগিতা করে এ প্রসঙ্গে গল্পকার বলেছেন— "মাগারাম ছাগলগুলোকে বারান্দা থেকে খেদিয়ে নামায়। গোবর- মাড়ুলি দেওয়া নিকানো উঠোনের কোণে মাদি ছাগলটা বেঁধে, মুখের সামনে সে ফেলে দেয় গুচ্ছেক পাতপালা। ছানাগুলো খেলে বেড়ায়।"[৩] কাজের বিষয়ে বেদোনির শাশুড়ি বড়ই ঢিলেঢালা। তাই যত দায়িত্ব বেদেনির উপর। কাজে বেরোনোর আগে সংসারের সমস্ত বিষয়গুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখতে হয় তাকে। বেলা শেষের দিকে হলে কাজ থেকে ফিরে এসে কিছু খাওয়ার থাকে না ঘরে। দু একটা ভুট্টা ভেঙে নেয় ঢেঁকিতে। আর তার শাশুড়ি সেটা সিদ্ধ করে রাখে। তারা নুন দিয়ে, গুড় দিয়ে সেটাকে খেয়ে নেয়। আবার কোনো কোনো দিন তারা গুঁন্দলু ঘাঁটাও খায়, কোদো খায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে দলিত শ্রেণির মানুষেরা যখন নিজের পেটের আগুন, খিদা নেভাতে না পারে তখন অনিবার্যভাবেই তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ঘরের সন্তানেরা কান্না করলে মাগারাম বিরক্তি প্রকাশ করে বলে— "হরবকত টাঁহা- টাঁহা লাগাই আছে।— সুগম থাক!"[৪]

সংসারের টান পড়লে যে কোন মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে না। এই সময়ে ঘরের কোনো খাবার মজুত নেই। শুধুমাত্র মুড়ি ভাজার জন্য চাল গুলিয়ে রেখেছে বেদনি। খোলাতে বালি দিয়ে সামান্য কঞ্চির জ্বালানি ব্যবহার করে মুড়ি ভাজে তারা। এভাবে তাদের জীবন খেয়ে, কখনো না খেয়ে, কখনো আধপেট খেয়ে অতিবাহিত করতে হয়। গল্পকার এই দলিত শ্রেণির যেভাবে বিবরণ দিয়েছেন তা সত্যিই অনবদ্য। কাজের সন্ধানে পথে যেতে যেতে বেদনির রুপার নাকছবিটা তীব্র রোদে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। রোদ থেকে বাঁচার জন্য সে মাথার ঝুড়ির তলায় চেপে রাখা ঘোমটা টা আরেকটু সামনের দিকে টেনে নিয়ে ঝুলিয়ে নেয়। আর বাঁদিকের কাঁখে তার ছোট সন্তান নুনুকে রাখে। এরকম মাথা বোঝা নিয়ে কাঁখে সন্তান নিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম ছুটে চলা— এই নিরন্তর নারীর

দুর্বিষহ জীবনের চিত্র সৈকত রক্ষিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবরণ দিয়েছেন। পুরুলিয়ার দলিত সমাজ জীবনকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন। তাদের সংসার জীবনকে তিনি লক্ষ করেছেন, তাদের সঙ্গে থেকেছেন, গল্প করেছেন। তার ফলে এতো নিখুঁত বর্ণনা তিনি দিতে পেরেছেন।

বৈষ্ণবপুর, তড়াড়ি, মালডি ইত্যাদি গ্রামে তারা জীবিকার সন্ধানে যায়। এইসব গ্রামে তারা খুব একটা সময় আসে না। এই অজানা অচেনা গ্রামে ঢুকেও আনাড়ির মতো তারা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় দুটো খাবার আশায়, জীবিকা নির্বাহের আশায়। এই জীবিকা নির্বাহের আশায় কখনো কখনো তাদেরকে খালি হাতে হতাশায় বাড়ি ফিরতে হয়। মালডিতে মাগারাম শিমুলের দুটো মস্ত মস্ত গাছ দেখেছিল কিন্তু সেখানে গিয়েও তাদের তেমন কোনো লাভ হয়নি। সে কারণেই খানিকটা হতাশা হয়ে তারা সেখান থেকে চলে আসে। এরকম আশা হতাশার জীবন নিয়ে মাগারামের মতো পরিবারেরা কাধের আঁকশি নামিয়ে হেঁটে চলে মাইলের পর মাইল। এই বাইরের জীবনে মাগারাম যেমন হতাশা হয় তেমনি আবার সাঁওতালদের বস্তিতে ঢুকে নানা ধরনের খেলা তামাশা দেখে সে আনন্দও পায়;— ভুলে যায় অনেক সময় পেটের খিদে। এ প্রসঙ্গে গল্পকার বলেছেন— "মালডি ছেড়ে আসার আগে লোকজনের ভিড় আর ডুগডুগির আওয়াজ পেয়ে তারাও ঢুকে গেছিল সাঁওতালদের বস্তিতে। সেখানে আচম্বিতে ভালুকের নাচ দেখতে পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিল তারা। ভিড়ের ভেতরে ঢুকে, সব ভুলে গিয়ে, সে নাচ শিশুর মতোই উপভোগ করেছিল। হেসেছিল। তালিও দিয়েছিল। এখনও তার রেশ কাটেনি।"[৫]

সমাজের একেবারে উঁচু শ্রেণির মানুষেরা নিশ্চিন্তে খেতে পরে আরাম বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারে। তার পাশাপাশি মাগারামের মত আরেক দল মানুষ শুধু অসহায়, সর্বহারা হয়ে জীবন যাপন করে।

এ প্রসঙ্গে গল্পকার বলেছেন— "জগতের নিয়মই এমন। একদল প্রাচুর্য নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে, আবার মাগারামের মতো আরেক দল শুধু অসহায় দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আনচান করতে থাকে। জিভে জল এসে গেল মাগারামের। চোখ ভরে এলো অশ্রুতে। একজন অবস্থাপন্ন স্বচ্ছল মানুষের পাশাপাশি এক অভুক্ত ক্ষুধার্ত মানুষের চিত্র বড়ই করুণ। বড় হৃদয় বিদীর্ণ করা। বেমানান। নিজের অশ্রু গোপন করতে গিয়েও তা পেরে উঠল না মাগারাম। সেই কাতরতা বেরিয়ে পড়ল তার মুখের ভাষায়। রীতিমতো সম্ভ্রমের সঙ্গে সে বলল, 'দেন আইজ্ঞা, সুবিস্তা হিসাবে দিয়ে দেন। আজ দিনভর ঘুরছি। কিন্তুক একটা গাছও জুটাতে পারি নাই।"[৬] এই নিরন্ন মানুষের চিত্র এ গল্পে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। যাদের কাছে মোটা রকমের অর্থ আছে, তাদের দ্বারায় পদ পৃষ্ট হয়ে, দলিত হয়ে, বঞ্চিত হয়ে রয়েছে সমাজের একশ্রেণির মানুষ;—যাদের দলিত বলা হয়। এই শ্রেণির মানুষের চিত্রই অঙ্কন করেছেন গল্পকার তাঁর উক্ত গল্পে।

গল্পকার সৈকত রক্ষিত পুরুলিয়া জেলার একেবারে প্রান্তিক শ্রেণির তথা দলিত শ্রেণির মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন এই 'আঁকশি' গল্পে। তিনি এই গল্পে দেখাতে চেয়েছেন মাগারামের মতো পরিবারের মতো মানুষেরা সমাজের একেবারে তারা নিচু তোলার মানুষ। তাদের না আছে ঘরদোর, না আছে বাসস্থান। মাগারামের স্ত্রী

বেদনি সে কাঁখে করে নিজের ছটো সন্তান নুনুকে নিয়ে ও মাথায় বোঝা নিয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছুটে চলে সামান্য দুটো খাবার আশায়। কিন্তু এই খাবার তারা কোনো সময় পায় আবার কোনো সময় উপোস করে। নুনু ছোট ছেলে তার বয়স বেশি হয়নি। সে টানা এক বেলা না খেয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ নিচুতলার অথবা দলিতশ্রেণির মানুষদের চিত্র ও তাদের জীবনযন্ত্রণার ছবি অঙ্কন করেছেন মাগারামের পরিবারের মধ্য দিয়ে গল্পকার। তাই এই গল্পটি হয়ে উঠেছে দলিত সমাজের বাস্তব দলিল।

তথ্যসূত্র

১. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা, সৈকত রক্ষিতা নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫,পৃ:-১২
২. তদেব, পৃ:-১৪
৩. তদেব, পৃ:-১৪
৪. তদেব, পৃ:- ১৪
৫. তদেব, পৃ:- ১৫-১৬
৬. তদেব, পৃ:- ১৭